সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে নারী প্রতিনিধিত্ব

ড. মুহম্মদ মনিরুল হক

সহস্র বছর ধরে সমাজ গঠনে, বিকাশে, উন্নয়নে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কম নয়। কিন্তু ইতিহাসে যতদিনে উদ্ভব ঘটেছে সার্বভৌম রাষ্ট্রের, নারী ততদিনে অর্জন করেছে নিষ্ঠুর বন্দিত্ব। রাষ্ট্রের উন্মেষকাল থেকেই রাষ্ট্র চালাবার অধিকার পুরুষের, রাজনীতি পুরুষের অর্থাৎ ক্ষমতা পুরুষের, সিদ্ধান্ত পুরুষের, আইন পুরুষের, শিক্ষা পুরুষের, প্রশাসন পুরুষের।[১] পুরুষতন্ত্র নারীকে নিয়োগ করেছে একরাশ ভূমিকায় বা দায়িত্বে। নারীকে নিয়োগ করেছে কন্যা, মাতা, গৃহিণীর ভূমিকায়; এবং তাকে দেখতে চায় সুকন্যা, সুমাতা, সুগৃহিণীরূপে।[২] বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীকে সমাজে ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে স্বাধীনভাবে বিচরণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী প্রতিনিধিদের আগ্রহ থাকলেও পুরুষ সদস্যের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব, ক্ষমতা চর্চা ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে।[৩] বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি অপরিহার্য উপাদান বা গ্রামীণ বিরোধের প্রাথমিক মীমাংসাস্থল হচ্ছে সালিশ। সে কারণে ১৯৯৭ সালে আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারী প্রতিনিধিদের সালিশে ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়। আলোচ্য গবেষণায় সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধির ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যে

১. সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধির ভূমিকা অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;

২. সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধির প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিয়ত নারীকে সংকটের সম্মুখীন করছে। সমাজে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রেখেই নারীর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে হয়। নারীর কাজ করার অনুকূলে যে ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা একান্তভাবে প্রয়োজন, সে সব সুবিধা সমাজে তৈরি হয় নি। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের অনুপস্থিতি, পাশাপাশি প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে নারীর যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই নারী বৈষম্যের শিকার। ফলে স্থানীয় পর্যায় থেকে রাষ্ট্রের সকল স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ কম। যেখানে অংশগ্রহণ আছে সেখানে আবার কাজের অনুকূল পরিবেশের অভাব। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব আরো বেশি। কেননা, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের আয় নিম্ন পর্যায়ের, শিক্ষার হার কম, ধর্মীয় প্রভাব ও কুসংস্কার গ্রামীণ জীবনে প্রবলভাবে কাজ করে। গ্রামীণ সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থা

অনুন্নত এবং প্রচার মাধ্যম সীমিত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে গ্রামীণ জনগণ তেমনভাবে সম্পৃক্ত নয়। সর্বোপরি গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য ও অনুশীলন তেমন নেই। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে বহু নীতি নির্ধারণ করা হলেও তার সফল বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সম্ভব হয় নি। উপরন্তু, ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কাজে নারী প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকলেও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার কার্যকর প্রভাব পাওয়া যাচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সাল থেকে গ্রামীণ বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিগণ কী ভূমিকা রাখেন বা আদৌ কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন কি না তার মূল্যায়ন করা জরুরি।

গ্রামাঞ্চলের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় যে আদালত গঠিত হয় তাকে গ্রাম আদালত বলে। ৯ মে, ২০০৬ থেকে গ্রাম আদালত আইন কার্যকর হয়েছে। ৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। এরা হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, আবেদনকারীর পক্ষে ২ জন প্রতিনিধি (১ জন ইউপি সদস্য ও ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি), প্রতিবাদী পক্ষের ২ জন প্রতিনিধি (১ জন ইউপি সদস্য ও ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি)। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গ্রাম আদালত আইন ২০০৬-এর কিছু সংশোধনী আনা হয়, কিন্তু তাতে নারী প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয় নি।[৪] কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হিসেবে গ্রাম আদালতে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। এ কারণে সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা বিষয়ক গবেষণা অধিক যুক্তিসংগত।

নারীবাদের ধারণাটি বিভিন্ন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরন্তু রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নারীবাদ, যাতে নারীর সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও বলা যায় যে, নারীবাদ হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব, যা নারীসমাজের ওপর পুরুষের নিপীড়ন, এর কারণ, ফলাফল ও নারীমুক্তির কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।[৫] নারীবাদ এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে যেখানে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বিভেদ কল্পনা করা যায় না। এটি এমন একটি দিকনির্দেশনা যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের নেপথ্যে উভয় লিঙ্গই উৎকৃষ্ট চলক। একাধারে নীতি-নির্ধারণ, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেখানে সকলের সমান অংশীদারিত্ব। এজন্য দেখা যায় যে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও বর্তমান গবেষণা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করবে।

স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টা আরো জোরদার এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়। তা ছাড়া, নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করে। বর্তমান গবেষণা নারী উন্নয়নের জন্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধি

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার আইনের ৫ম ধারায় প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন নারী সদস্য এবং একই ধারার ৩য় উপধারায় নারী সদস্যের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত করার বিধানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হয়। প্রতি ইউনিয়নে দু'জন নারী সদস্যের মনোনয়ন প্রথা পরিবর্তিত হয়ে ১৯৯৭-এ সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ইউনিয়ন প্রতি ৩ (তিন) এ উন্নীত করা হয় এবং আসনসমূহে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবর্তন আসে গ্রামসমাজের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতেও। যে পরিবারের নারী কখনো ভোট দিতে অনুমতি পেতেন না, সে পরিবারের নারীরাও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং সশরীরে ভোটারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। ভোটাররা তাদের গ্রহণও করে নেন।[৬] ১৯৯৭-এ অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৮০%) নারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ২০০৩-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৩২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২২ জন, সদস্য পদের সাধারণ আসনে ৬১৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৯ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য আসনে ৩৯,৪১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১২,৬৮৪ জন নারী নির্বাচিত হন। ২০১১-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১৮ জন নারী ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন।[৭]

বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৪৫টি।[৮] প্রতিটি ইউনিয়নে সংরক্ষিত নারী আসন ৩টি। এ ব্যবস্থার পর ইতোমধ্যে ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। এতে ব্যাপকসংখ্যক নারী নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করেও স্থানীয় নেতৃত্বে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৫ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নারীদের জয়ের এই সংখ্যা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।[৯]

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯-এ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে কার্যবিধি বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাতে পুরুষ ও নারী সদস্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। অর্থাৎ নারী সদস্যগণ পুরুষ সদস্যের মতোই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। ধারা ৪৭(৩)-এ বলা হয়েছে, সরকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের (টিআর, কাবিখা, থোক বরাদ্দ ও অন্যান্য) ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সংরক্ষিত আসনের সদস্যকে অর্পণ করতে হবে।[১০] ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নারী সদস্যদের ওপর ১২টি বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, হাঁস-মুরগি পালন, হস্ত ও কুটির শিল্প, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।[১১]

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার সবগুলো (৭টি) ইউনিয়ন নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। ভৈরব উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে ২০১১ সালে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি ছিলেন ২১ জন এবং

উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনে ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন ১ জন। উক্ত ইউনিয়নগুলোতে সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধি ছাড়া সাধারণ আসনে নির্বাচিত কোনো নারী সদস্য নেই। গবেষণায় মূলত প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো, গবেষণা পদ্ধতির বিন্যাস এবং প্রাথমিক তথ্যের বিশ্লেষণের প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎস থেকে আহরিত তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাধীন ভৈরব উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের মোট ৮৪টি গ্রামে বসবাসরত প্রত্যেক নারী বর্তমান গবেষণার সমগ্রক একক (population unit)। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) পদ্ধতির আলোকে উপজেলার সকল গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করে এমন গ্রাম হিসেবে প্রতি ইউনিয়ন থেকে ১টি করে ৭টি ইউনিয়ন থেকে মোট ৭টি গ্রামকে প্রতিনিধিত্বমূলক (typical) গ্রাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সরল নির্বিচারী নমুনায়ন (simple random sampling) পদ্ধতির মাধ্যমে মোট ৩৯২ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে গবেষণার নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। এ ছাড়া, ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ভৈরব উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের প্রতি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত ৩ জন করে মোট ২১ জন সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি এবং ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ভৈরব উপজেলার নির্বাচিত নারী ভাইস-চেয়ারম্যানকে গবেষণায় অধ্যয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উভয় ধরনের উত্তরদাতার জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার যথাযথ পরিপক্বতার জন্য গবেষিত এলাকার পুরুষ প্রতিনিধি অর্থাৎ ২০০৯ সালের নির্বাচনে ৭টি ইউনিয়ন পরিষদের ৭ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং ২১ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর/মেম্বারের সাথে নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যকার বিভিন্ন ধরনের বিরোধ মীমাংসা কিংবা শাস্তি প্রদানের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দু'টি পদ্ধতিই বিদ্যমান। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিটি হল সালিশি বা সালিশ। সালিশ গ্রামের পুরনো প্রথা। সালিশ গ্রামীণ দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিরোধ, মনোমালিন্য ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা নিরসনের প্রধান উপায়।[১২] সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সালিশের গঠন প্রকৃতিতেও বিভিন্ন রকম পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু অন্তত দুটি বিষয়ে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি : ১. সালিশ অত্যাবশকীয়ভাবে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন; ২. পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সালিশ পুরুষের স্বার্থ রক্ষার্থে পুরুষ কর্তৃক গঠিত সংগঠন।[১৩] গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামের প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরাই সালিশের সদস্য হন।[১৪] সালিশে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও তাদের সচেতনায়তন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ সালিশে নারীদের সম্পৃক্ত করার প্রয়াস শুরু করে।[১৫]

গ্রামে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, মীমাংসা ও শাস্তি প্রদানের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত। ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচারমূলক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ বলে ১ জন চেয়ারম্যান এবং বাদী ও বিবাদী পক্ষে ২ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ৫ জনের সমন্বয়ে 'গ্রাম আদালত' গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ বলে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন করে নারী সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ফলে বিচারমূলক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অভিগম্যতা তৈরি হয়। নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো বিচারকার্য সমাধার জন্য গ্রাম আদালতে পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি নারী সদস্যরা বাদী এবং বিবাদী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। নারী সদস্যদের বিচারমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা পালনে স্থানীয় ও জাতীয়

পর্যায়ের এনজিও তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকে।[১৬] এ কারণে সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধি কোনো ভূমিকা রাখে কি না তা যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধি ও গবেষিত এলাকার সাধারণ নারীদের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়, যা সারণি **১** ও ২-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১ : সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে রাখা ভূমিকা সম্পর্কে নারী প্রতিনিধির মতামত

নারী প্রতিনিধির মতামত		
হ্যাঁ	না	মোট
৭ (৩১.৮০%)	১৫ (৬৮.২০%)	২২ (১০০%)

উৎস : *মাঠ জরিপ*, ২০১৩

সারণি ২ : সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ নারীদের মতামত

সাধারণ নারীদের মতামত				
হ্যাঁ	না	জানি না	নিরুত্তর	মোট
৫ (১.৩০%)	৩৭৩ (৯৫.২০%)	১৩ (৩.৩০%)	১ (০.৩%)	৩৯২ (১০০%)

উৎস : *মাঠ জরিপ*, ২০১৩

সারণি-১ ও সারণি-২ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে নিশ্চিত হওয়া যায়, সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধিরা উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখেন না।

সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা

সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখেন এমন মতামত দিয়েছেন গবেষিত এলাকার ৭ জন নারী প্রতিনিধি। তাঁরা কীভাবে ভূমিকা রাখেন এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তাঁদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিরোধ নিরসন ও সালিশে তাঁরা নিজে উপস্থিত হয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখেন। সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধি ভূমিকা রাখেন এমন মতামত দিয়েছেন গবেষিত এলাকার সাধারণ নারীদের মধ্যে ৫ জন। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তাঁদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধি নিজে উপস্থিত থেকে ভূমিকা রাখেন।

সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা না রাখার কারণ

সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধি ভূমিকা রাখেন না মতামত দিয়েছেন মোট ১৫ জন নারী প্রতিনিধি এবং গবেষিত এলাকার ৩৭৩ জন সাধারণ নারী। নারী প্রতিনিধিরা কেন ভূমিকা রাখেন না এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়, যা সারণি ৩ ও সারণি ৪-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩ : সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে ভূমিকা না রাখার কারণ সম্পর্কে নারী প্রতিনিধির মতামত

নারী প্রতিনিধির মতামত		
সচেনতার অভাব	গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব	মোট
৫ (৩৩.৩৩%)	১০ (৬৬.৬৬%)	১৫ (১০০%)

উৎস : *মাঠ জরিপ*, ২০১৩

সারণি ৪ : সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা না রাখার কারণ সম্পর্কে গবেষিত এলাকার সাধারণ নারীদের মতামত

সাধারণ নারীদের মতামত				
বিচারকার্যে অদক্ষতা	গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব	সচেতনতার অভাব	অন্যান্য	মোট
২৬৬ (৭১.৩১%)	১০ (২.৬৮%)	৩২ (৮.৫৮%)	৬৫ (১৭.৪৩%)	৩৭৩ (১০০%)

উৎস : *মাঠ জরিপ*, ২০১৩

সারণি ৩-এ দেখা যায়, সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে কোনো ভূমিকা রাখেন না যে সকল নারী প্রতিনিধি তাঁদের বেশিরভাগই মতামত দিয়েছেন গ্রামীণ এলিটদের প্রভাবের কারণে ভূমিকা রাখতে পারেন না। সারণি ৪-এ উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায়, ৩৭৩ জন সাধারণ নারীর মধ্যে ২৬৬ জন (৭১.৩১ শতাংশ) মতামত দিয়েছেন নারী প্রতিনিধির বিচারকার্যে অদক্ষতার কারণে সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধি কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। মাঠ পর্যায়ে কথা বলে জানা যায়, সাধারণ নারীরা মনে করেন, সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে বিচারকার্য সম্পাদন করার মতো যথাযথ যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষমতা, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা নারী প্রতিনিধির নেই। উত্তরদাতা সাধারণ নারীদের মধ্যে ৬৫ জন (১৭.৪৩ শতাংশ) মতামত দিয়েছেন অন্যান্য। মাঠ পর্যায়ে কথা বলে জানা যায়, অন্যান্য কারণ হিসেবে তাঁরা মনে করেন, নারী প্রতিনিধিদের

বিচারকার্য সম্পাদন করার মতো যথাযথ ইচ্ছা, সততা ও আন্তরিকতা নেই। তা ছাড়া, গবেষিত এলাকার নারীদের স্বামীরাও অনেক সময় অসহযোগিতা করেন। সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা না রাখার কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতা সাধারণ নারীদের মধ্যে ৩২ জন (৮.৫৮ শতাংশ) মতামত দিয়েছেন সচেতনতার অভাব এবং ১০ জন (২.৬৮ শতাংশ) মতামত দিয়েছেন গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব। অতএব, সারণি ৩ এবং সারণি ৪-এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে নিশ্চিত হওয়া যায়, বিচারকার্যে নারী প্রতিনিধির অদক্ষতা, গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব, সাধারণ নারী ও নারী প্রতিনিধির সচেতনতার অভাব, স্বামীদের অসহযোগিতার কারণে সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে তাঁরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। এ বিষয়ে গবেষিত এলাকার পুরুষ প্রতিনিধির সাথে কথা বললে তাঁরা জানান, বিচারকার্য সম্পাদন, বিরোধ নিরসন ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা অধিকাংশ নারী প্রতিনিধিরই নেই।

উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, সংরক্ষিত আসনব্যবস্থায় নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য সময়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ইতিহাস গবেষিত এলাকার নারীদের একবারেই নেই। গবেষিত এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীর অংশগ্রহণের হার নগণ্য। সংরক্ষিত নারী আসনের (স্কুল কমিটি, কলেজ কমিটি ইত্যাদি) পদগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা খুবই কম, এমনকি তাঁদের আগ্রহও কম। রাজনীতি-সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে এনজিও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এমনকি রাজনৈতিক দলের কোনো জোরালো কার্যক্রম চোখে পড়ে না। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, গবেষিত এলাকার ক্ষমতা কাঠামোতে সাধারণ নারীরা অন্তর্ভুক্ত নন, এমনকি বাস্তবে নারী প্রতিনিধিরাও নন। সালিশে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির কেউ কেউ অংশগ্রহণ করলেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন না।

মাদারীপুর লিগ্যাল এইড নামক একটি এনজিও ভৈরব উপজেলার মোট ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪টি ইউনিয়নের গ্রাম আদালতে নারী প্রতিনিধিকে উপস্থিত রাখা এবং তাঁদের কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সহায়তা করছে। মাঠ পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, এ কারণে এই ৪টি (আগানগর, শিমুলকান্দি, শ্রীনগর, সাদেকপুর) ইউনিয়নের গ্রাম আদালত প্রায় নিয়মিত হয় এবং গ্রাম আদালতে ১ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী প্রতিনিধি তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। বাকি ৩টি (কালিকাপ্রসাদ, গজারিয়া, শিবপুর) ইউনিয়নের গ্রাম আদালত নিয়মিতভাবে হয় না। কখনো-সখনো গ্রাম আদালত বসলেও নারী প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন না।[১৭] সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে গবেষিত এলাকার নারী প্রতিনিধি এবং সাধারণ নারীর মতামত বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নারী প্রতিনিধিরা যথাযথ ভূমিকা রাখেন না। এক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা রাখার ইচ্ছে থাকলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে তাঁরা ভূমিকা রাখতে পারছেন না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ সদস্যের অধিকতর কর্তৃত্ববাদী মনোভাব প্রধান প্রতিবন্ধক। ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত নারীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না। সে কারণে সামাজিক বিরোধ নিরসন ও সালিশে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধির যথাযথ ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

১. সালিশ ও বিচারে নারী প্রতিনিধির যথাযথ ভূমিকা রাখার জন্য নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সহায়তা প্রদানের জন্য নারী প্রতিনিধির ক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্ব স্ব এলাকায় নারী নির্যাতন প্রশমনের ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করে সে ব্যাপারে তাঁদের তৎপর করা প্রয়োজন।

২. গ্রাম আদালত আইনের কাঠামো সংশোধন করে নারী প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্তত নারী ইস্যু বিষয়ক সালিশগুলোতে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ভূমিকা রাখার জন্য আইন করা যেতে পারে।

৩. গ্রামীণ সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সালিশ ও বিচারে নারী-পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নারী প্রতিনিধির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং স্ব স্ব এলাকার শিক্ষিত, সচেতন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪. নারী প্রতিনিধির ক্ষমতা, কার্যাবলি, মর্যাদা ও সম্মানী বৃদ্ধি করে অন্তত এমন করা যেতে পারে, যাতে নারী প্রতিনিধির পদটির প্রতি শিক্ষিত, সচেতন ও মর্যাদাশীল পরিবারের সদস্যদের আগ্রহ বাড়ে। ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও মর্যাদাশীল পরিবারের শিক্ষিত নারীরা নারী প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে এবং নির্বাচিত হলে বর্তমান ব্যবস্থায় অধিকতর সুফল আসবে বলে আশা করা যায়।

ড. মুহম্মদ মনিরুল হক সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। dr.mmh.ju@gmail.com

তথ্যপঞ্জি

১. ফৌজিয়া খান, "নারীর রাজনীতি : রাজনীতির নারীবাদ" রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত), *নারী ও প্রগতি*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা ১০।

২. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১-১৫।

৩. ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, *নারী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা : ভৈরব উপজেলার কেস স্টাডি।* অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৫।

৪. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৩।

৫. মো. আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৪।

৬. রোকেয়া কবীর (সম্পাদিত), *নারী ও প্রগতি*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস), ঢাকা, বর্ষ, ৩, সংখ্যা ৬, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা ১।

৭. ড. নাসিম আখতার হোসাইন, "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান", আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষা*, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১, সাভার, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৯।

৮. *ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ : একটি মূল্যায়ন,* জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), আগারগাঁও, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১২।

৯. *দৈনিক প্রথম আলো,* জুন, ১৪, ২০১৬।

১০. মো. নাজিমউদ্দিন, *স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা,* মাতৃভাষা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৯।

১১. মোজাম্মেল হক ও কে. এম. মহিউদ্দিন, *ইউনিয়ন পরিষদে নারী : পরিবর্তনশীল ধারা,* বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৫৫।

১২. উদ্ধৃত, হক ও মহিউদ্দিন, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা ৫৮।

১৩. মান্নান, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা ৬৪।

১৪. Kirsten Westergaard, “People’s Empowerment in Bangladesh N. G. O. Strategies” *The Journal of Social Studies,* Voll. 72, Dhaka, April, 1996, pp. 27-57.

১৫. হক ও মহিউদ্দিন, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা ৫৯।

১৬. *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা ৫৯-৬১।

১৭. *মাঠকর্মের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ প্রতিনিধি থেকে প্রাপ্ত তথ্য,* ভৈরব, ২০১৩।